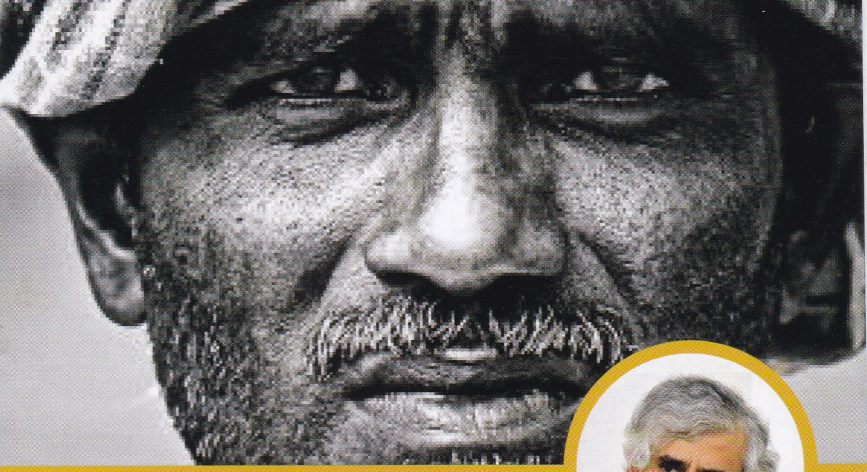

কেমন আছে গ্রাম ভারত

পি সাইনাথ

গণশক্তি
সরোজ মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৮

সরোজ মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৮

কেমন আছে গ্রাম ভারত

পি সাইনাথ

গণশক্তি

কেমন আছে গ্রাম ভারত
পি সাইনাথ

আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
অভীক দত্ত
গণশক্তি ট্রাস্ট
৭৪এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ
চন্দন দে

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি.
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ১০ টাকা

ভূমিকা

গণশক্তি পত্রিকার ৫০বছর উদযাপনের সময়েই আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে এখন থেকে প্রতি বছর কমরেড সরোজ মুখার্জি এবং কমরেড অনিল বিশ্বাসের নামে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। সেই অনুসারে গত ৯ই জুন, ২০১৮ তারিখে মৌলালির যুবকেন্দ্রে প্রথম সরোজ মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'কেমন আছে গ্রাম ভারত' বিষয়ে এই স্মারক ভাষণ দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ। গ্রামীণ ভারতের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে সাইনাথ তাঁর ভাষণে শুধু কৃষি সঙ্কট নয়, ব্যাপকতর এক দুর্যোগের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তার জন্য নয়া উদারনীতির রূপায়ণকারী শাসকদলগুলিকে দায়ী করেছেন। বহু তথ্য এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই ভাষণ শ্রোতাদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। আজকের দিনে একদিকে কর্পোরেট মিডিয়ায় গ্রামীণ ভারতের সংবাদ যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে গ্রামীন উন্নয়নের সাফল্য সম্পর্কে শাসকরা নানা অবাস্তব দাবি করছেন। এই অবস্থায় গণপরিসরের বিতর্কে গ্রামীন ভারতকে বস্তুনিষ্ঠভাবে আরও বেশি করে তুলে আনতে সহায়ক হতে পারে সাইনাথের এই ভাষণ। এই প্রত্যাশা নিয়ে স্মারক বক্তৃতাটিকে নিবন্ধাকারে প্রকাশ করা হল। এই প্রকাশনার কাজে প্রয়োজনীয় অনুলিখন এবং অনুবাদে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই সংযুক্তা চৌধুরী, নীলাদ্রি সেন এবং স্মিতা খাটোরকে। পিপলস্ আর্কাইভ অব রুরাল ইন্ডিয়া (পারি) কে গনশক্তির তরফ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । গণশক্তির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কমরেড সরোজ মুখার্জির নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতাটি কৃষক আন্দোলন ও গণআন্দোলনের কর্মীদের কাজে লাগবে বলেও আশা রইলো।

অভীক দত্ত
সম্পাদক, গণশক্তি

গ্রামীণ ভারতের জীবনযাত্রা, সংকট নিয়ে কোনও আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, গ্রামীণ ভারতের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। জনগণনায় শহরের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যখন জনসংখ্যা ৫০০০ অতিক্রম করে যায়, তখন গ্রামকে আর গ্রাম হিসাবে গণ্য করা হয় না। যে এলাকার জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫০০০ অথবা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তার ঘনত্ব ন্যূনতম ৪০০ এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে যার শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষ অকৃষিজীবী, সেই এলাকাকে শহর বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশে দুই ধরনের শহর দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বিধিবদ্ধ শহর, যেখানে পৌরবোর্ড, কর্পোরেশন এবং নোটিফায়েড এরিয়ার মতো নির্বাচিত বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। পুলিশ, দমকল, কলেজ প্রভৃতির সংস্থান আছে। দীর্ঘ

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এরা শহরে পরিণত হয়েছে। অপরটি হলো জনগণনা অনুসারে শহর। এগুলিকে ঠিক শহর বলা যায় না। ভেঙে পড়া গ্রাম থেকে জন্ম হয়েছে এই সব শহরের। যখন এইরকম অনেকগুলি গ্রাম ভেঙে পড়ে, শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষ সেখানে অকৃষিজীবী হয়ে ওঠেন এবং জনসংখ্যা ৫০০০ ছাড়িয়ে যায় এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তার ঘনত্ব ৪০০ হয়ে যায়, তখন তাকে জনগণনা অনুসারে শহর বলে ধরা হয়।

১৯৯১ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত জনগণনার দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সঠিক শহরগুলি মাথা তুলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ এই সময়কালে গ্রামগুলি ভেঙে গড়ে উঠেছে জনগণনা অনুসারে শহর। এই সব শহর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এর থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে, গ্রাম্য অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভেঙে পড়া গ্রামের জায়গা নিয়েছে বিবর্তনহীন, অপরিকল্পিত শহর, যার জন্ম ভাঙনের মধ্য দিয়ে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ গ্রামীণ সংকট শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নেই। কৃষির সংকট এখন কৃষিকেও ছাপিয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর ধরে তা সামাজিক সংকটের চেহারা নিয়েছে। ৩ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যাকে এখন আর মানুষের জীবনহানি অথবা উৎপাদনের ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। আসলে এটি আমাদের মানবিকতার স্খলন। এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী নীতি, যা মানুষেরই তৈরি। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খরা থেকে তা দেখা দেয়নি। আমরা এক মারাত্মক জল সংকটের মধ্যে রয়েছি, যা তৈরি হয়েছে নীতিগত কারণে। মানুষই এর জন্য দায়ী। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। গত শতকের নয়ের দশকের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে বহুবিধ সংকটে আমরা নিমজ্জিত। তবে এর কিছু উপাদান ওই নয়ের দশকের আগে থেকেই বিদ্যমান। অর্থাৎ ধনতন্ত্র রয়েছে ধনতন্ত্রেই। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সমীক্ষায় প্রকাশ, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৫-এর মধ্যে সাড়ে ৩ লক্ষ কৃষক কৃষির সংকটের কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। গত দু' বছর যাবৎ এই সংস্থাটির তরফে কৃষক সম্পর্কিত কোনও তথ্যই আর প্রকাশ করা হচ্ছে

না। বলা হচ্ছে, তারা নাকি এখন সব কিছু আবার খতিয়ে দেখছে। ২০১৪ সালে এই সংস্থা তাদের তথ্য প্রকাশ ছয় মাস পিছিয়ে দিয়েছিল। কারণ, কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা সম্পর্কে নিজের রাজ্যের তথ্য নিয়ে গুজরাটেরই আপত্তি ছিল। তাই মোদী সাহেব তথ্য প্রকাশে নারাজ ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে নমনীয় করে তোলা না যায়।

আরও এক বড় সংকট হলো জল সংকট। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যিটা হলো, এই জল সংকট আসলে সরকারের নীতিরই ফল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, লাগামহীন জলের তারতম্য এবং ঘুরপথে জলের বেসরকারিকরণ এই সংকট ডেকে এনেছে। প্রত্যেক বছর বৃষ্টির অভাব দেখা দিলেই মহারাষ্ট্রে দরিদ্র নারীদের ট্যাঙ্কের সামনে জলের লাইনে অপেক্ষার ছবি আমরা দেখতে পাই। মারাঠাওয়াড়া, ঔরঙ্গাবাদে তিন থেকে চার ঘণ্টা বালতি, পাত্র নিয়ে জলের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। এর জন্য তাঁরা পারিশ্রমিক কী পান, তা আমরা কজন বলতে পারি! আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, এর জন্য তাঁরা প্রতি লিটারে ৪৫ পয়সা থেকে ১ টাকা পেয়ে থাকেন। অথচ এর জন্য আরও অনেক বেশি তাঁদের প্রাপ্য। কেন? কারণ, তাঁদের প্রায় ৪ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা জলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যে সময়ে তাঁরা অন্য কাজ করে উপার্জন করতে পারতেন। এই সময়ে হয় তো তাঁরা ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারতেন। শ্রেণি বিভাজন ও অসাম্যের রোগ, যা আমরা চোখে দেখতে পাই না, সেটিই এর কারণ। অথচ এই মারাঠাওয়াড়া, ঔরঙ্গাবাদেই ২৪টি মদ তৈরির কারখানা প্রতি লিটার ৪ পয়সা দরে প্রতিদিন ৫ লক্ষ কোটি লিটার জল পায়। ঘটনা হলো, গত ৩০ বছর ধরে এরা জল পেত ১ টাকা লিটার দরে। তাই কোনও এক ব্যক্তি আদালতে গিয়ে তা কমিয়ে ৪ পয়সা লিটার করে দিয়ে হিরো হয়ে গেলেন। তথ্যের অধিকার আইনে জানা গিয়েছে যে, দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রের শহরগুলি গ্রামগুলির তুলনায় শতকরা ৪০০ ভাগ বেশি জল পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মহারাষ্ট্রের ৩৬টি জেলার মধ্যে তিনটি জেলা– যথাক্রমে মুম্বাই, পুনে এবং নাসিক মহারাষ্ট্রের মোট পানীয় জলের

মধ্যে শতকরা ৫৩ ভাগ পেয়ে থাকে। ৩৬টির মধ্যে মাত্র ৩টি জেলা! তাদের মিলিত জনসংখ্যা মহারাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ। শ্রেণি বিভাজন ও অসাম্যর নীতির ফলই এই জল সংকট ডেকে এনেছে।

এর উপর রয়েছে জীবিকার সংকট। জীবনযাত্রার মানের ভয়াবহ অবনমনের পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। প্রবাদ আছে যে, আমাদের দেশ না কি কৃষকের দেশ! অথচ জনগণনা বলছে, আমাদের জনসংখ্যার ৮ শতাংশেরও কম হলেন কৃষক। এর মধ্যে খেতমজুরও রয়েছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। কৃষকের সংজ্ঞা হলো, যে ব্যক্তি বছরে ১৮০ দিন এক খণ্ড জমিতে চাষাবাদ করে থাকেন, তিনিই কৃষক। এর মানে, এইভাবে যিনি প্রাথমিক আয় করতে পারবেন, তিনিই কৃষক। যদি তাঁর অন্য কোনও আয়ের উৎস থেকেও থাকে, তা সত্ত্বেও তাঁকে কৃষক বলেই ধরা হবে। এখানে জমির মালিকানার কথা বলা নেই। বলা হচ্ছে, যিনি এক খণ্ড জমিতে চাষ করবেন। ফলে খেতমজুর এবং মহিলাদের সংখ্যা নিয়ে ধন্দ থেকেই যায়। কেন ১৮০ দিনের সময়সীমা? কারণ, কোনও কোটিপতি ব্যবসায়ীর যদি একটি আঙুরের খেত থাকে এবং ব্যবসা সামলিয়ে সপ্তাহের শনি ও রবিবার যদি তিনি সেখানে যান, তাহলে তিনিও একজন কৃষক বলেই ধরে নেওয়া হবে। এক সময়ে অমিতাভ বচ্চন নিজেকে কৃষক বলে দাবি করে জমির জন্য আবেদন করেছিলেন। উত্তর প্রদেশে তাঁর কৃষিজমি থাকার সুবাদে তিনি মহারাষ্ট্রেও জমি চেয়ে আবেদন করলেও শেষ পর্যন্ত অন্য তারকারাও একইভাবে এই আবেদন করতে পারেন, এমন আশঙ্কায় অমিতাভ বচ্চনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি।

ঘটনাচক্রে ভারতে কৃষির সঙ্গে মৎস্য পালন ও বনসৃজনও যুক্ত। এই সব কিছু যুক্ত করে নিলে ২০১১-তে কৃষকের সংখ্যা হয় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ, যা জনসংখ্যার ৮ শতাংশেরও কম। জনগণনা অনুসারে যাঁরা ১৮০ দিন জমিতে কৃষিকাজ করেন, তাঁদের সংখ্যা এটাই ধরা হয়ে থাকে। প্রধানত এঁরাই কৃষক। এই সংখ্যক কৃষককে বাদ দিলে সীমিত সংখ্যক কিছু কৃষক থাকেন, যাঁরা ছয় মাসের কম জমিতে কৃষিকাজ করে থাকেন। প্রধান কৃষকের সঙ্গে

এই সীমিত কৃষককে যুক্ত করলে দেখা যাচ্ছে, তা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯.৯ ভাগ। এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কৃষি-শ্রমিকদের যুক্ত করলে মোট জনসংখ্যার হিসাবে সেটি হয় প্রায় ২৪ শতাংশ। আমাদের খেয়াল রাখা দরকার, কৃষির উপর কারা নির্ভরশীল এবং কৃষক কারা। এই ফারাকটা গুরুত্ব দিয়ে বুঝে নেওয়া উচিত। কৃষির উপর নির্ভরশীল যাঁরা, তাঁরা হলেন আমাদের দেশে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মানুষ। দেশের মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় তা শতকরা ৬০ ভাগ। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, নীতি আয়োগের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ড. অরবিন্দ পানাগরিয়া এবং ড. জগদীশ ভাগবতী যৌথভাবে একটি বইয়ে লিখছেন যে, এদেশে কৃষকের আত্মহত্যা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। কারণ, জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশই না কি কৃষক! এমন কী এই বইয়ে কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করা হয়েছে। এঁদের এই বই আসলে মানুষকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা, যাতে কেউ বুঝতে না পারেন যে, কৃষির সঙ্গে যুক্ত সকলকেই কৃষক হিসাবে ধরা যায় না। কৃষি হলো এক বিশালাকার ক্ষেত্র, যার মধ্যে জনগণনার সংজ্ঞায় কৃষক ৮ শতাংশ।

নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি চালুর পর থেকে নাটকীয়ভাবে কৃষকের সংখ্যা কমে আসছে। অথচ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেতে দেখা গিয়েছে। কীভাবে? ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১-এর জনগণনায় প্রধান কৃষকের সংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। ২০০১ সাল থেকে ২০১১-তে তা ৭ কোটি ২০ লক্ষ। অর্থাৎ ২০ বছরে জনগণনার তথ্য অনুযায়ী প্রধান কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৫০ লক্ষ। অর্থাৎ এই সময়ে প্রধান কৃষকের সংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ২০০০ জন কমে গিয়েছে। এরা সকলে কোথায় গেলেন? জনগণনার তথ্য বলছে, প্রধান কৃষকের সংখ্যা যত কমে গিয়েছে, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে খেতমজুরের সংখ্যা। যেমন ধরা যাক অবিভক্ত অন্ধ্র প্রদেশের কথা। সেখানে ২০০১-২০১১'র জনগণনায় প্রধান কৃষক কমেছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ, অন্যদিকে খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। এর অর্থ, শুধু কৃষিতেই ধস নামা নয়, তার সঙ্গে জীবনযাত্রার মানেরও অবনমন। এই জীবনযাত্রার

সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন বয়নশিল্পী, গোয়ালা, বস্ত্রশিল্পী, তাঁতির মতো অন্য পেশার মানুষজনও। গত শতকের নয়ের দশকে তাঁতিদের আত্মহত্যা করতে দেখা গিয়েছিল। কারণ, প্রথাগতভাবে এই তাঁতিদের প্রাথমিক বাজারই হলেন কৃষক এবং খেতমজুররা। শুধু ১৯৯২-৯৩ সালেই পঞ্চমপল্লিতে ৯০ জন তাঁতি আত্মহত্যা করেন। আবার মধ্য প্রদেশেও খাদ্যাভাবে গ্রামের বয়নশিল্পীদের ব্যাপক সংখ্যায় মৃত্যু হয়। কেন? কারণ, তাঁরা কৃষকদের কাছ থেকে নগদে পান ৩০ শতাংশ এবং বাকি ৭০ শতাংশ পান শাক-সবজি ও শস্যের মাধ্যমে। যখন কৃষকরা ঋণের অর্থ শোধ করতে না পেরে নিঃসহায় হয়ে পড়েন, তখন তার প্রভাব পড়ে বয়নশিল্পীদের উপর। খাদ্যাভাবের তীব্রতায় তাঁদের মরতে হয়। এই ধরনের অসংখ্য মৃত্যুর তথ্য রয়েছে। সর্বপ্রথম সারা ভারত কৃষকসভার পক্ষ থেকে বয়নশিল্পীদের এভাবে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার প্রধান কারণ কৃষির সংকট এবং যে সংকটেরা জন্যই কৃষিকাজ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে জাতিগত জনগণনার ফলাফল জানা যায়। এতে আর্থ-সামাজিক যে চিত্র উঠে আসে, তাতে দেখা যায়, গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর আয় প্রতি মাসে ৫০০০ টাকার নিচে। গ্রামীণ পরিবারগুলির গৃহস্বামীদের শতকরা ৯০ ভাগের আয় প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকারও কম। গ্রামীণ পরিবারগুলির কজন গৃহস্বামী মাসে ১০ হাজার টাকার বেশি ঘরে আনতে সক্ষম? আমাদের দেশের মাত্র ৮ শতাংশ গ্রামীণ গৃহস্বামী। ভারতে গ্রামীণ পরিবারগুলির সংখ্যা ১৭ কোটি ৯০ লক্ষের মতো। এর মধ্যে সেইসব গৃহস্বামীই ১০ হাজার টাকার বেশি প্রতি মাসে আয় করেন, যাঁরা পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক অথবা রেলের, পূর্ত দপ্তরের (পি ডব্লিউ ডি) কর্মচারী। এখানেই শ্রেণিগত পার্থক্যের কথা উঠে আসে। ভারতের পরিবারগুলির মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ গৃহস্বামী মাসে ১০ হাজার টাকার বেশি আয় করে থাকেন। আর তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই হার ৪ শতাংশেরও কম। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আয় করে থাকেন সরকারি কর্মচারীরা। সুতরাং সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাসের অর্থ,

এই সমস্ত শ্রেণি ও জাতির ধ্বংসসাধন। আসলে আমরা এখন এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যখন সংগঠিতভাবে কর্পোরেট রাষ্ট্র দরিদ্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে।

'ন্যাশনাল সাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন' বা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি-অকৃষি মিলিয়ে পূর্ব উত্তর প্রদেশ, কেরালা ও পাঞ্জাবে কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারের গড় মাসিক আয় ৬৪২৬ টাকা। গোটা বিশ্বের দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখা যায়। ২০১৬-তে আমেরিকায় কৃষকদের ৮৫ শতাংশই আয় করেছেন অকৃষিকাজ থেকে। এরা কেউ কর্পোরেট কৃষক নন, ক্ষুদ্র কৃষক। মজুরি এবং আয়ের এক অদ্ভুত তারতম্য। অতীতে একজন ভাই জমিতে চাষাবাদ করতেন, অন্য ভাই প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। চাকরির শোচনীয় পরিস্থিতিজনিত কারণে সমস্ত রাজ্য পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ করছে। তাঁরা যা আয় করেন, তা রেগার কাজের মজুরিরও কম। অথচ একই সময়সীমা কাজের। ভয়ংকর সংকট চাকরির।

আমাদের ইতিহাসে আমরা এক বৃহত্তম অভিবাসন সংকটের মুখোমুখি হয়েছি। জোয়ারের মতো লক্ষ লক্ষ অভিবাসী এদেশে চলে আসছেন। ১৯২১-এর জনগণনা থেকেই আমরা দেখে আসছি, শহরের জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি। সেই ধারণা বদলে দিয়েছে ২০০১-এর জনগণনা। তাতে দেখা গিয়েছে, শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। অন্যদিকে গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১ কোটি ৩০ লক্ষ। আবার ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, গ্রামের জনসংখ্যা বেড়েছে ৯ কোটি আর শহরের ৯ কোটি ১০ লক্ষ। এর পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে। এক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যতিক্রম তিন-চারটি রাজ্য। দুই, এর কারণ কি পরিবারের সংখ্যা? না, তা নয়। কারণ, গ্রামীণ পরিবারগুলি আজও শহরের পরিবারগুলির তুলনায় বড়। তিন, অভিবাসন সমস্যা, যা অকল্পনীয়। জনগণনাতেও নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই অভিবাসনের। তবে উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। ওড়িশা ও আরও কয়েকটি রাজ্যে গ্রামগুলি কার্যত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কারণ, কাজ খুঁজতে মানুষ অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছেন। সেই সব গ্রামে বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া

বাকিরা চলে যাচ্ছেন কাজের সন্ধানে। এভাবেই গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ভেঙে যেতে দেখা যাচ্ছে ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়ের দরিদ্র এলাকাগুলিতে। এঁরা আর পুরানো পরিবারে ফিরে এসে একত্রিত হতে পারছেন না।

এক সর্বব্যাপী সংকট আমাদের গ্রাস করেছে। প্রধানত অসাম্যের সংকট। অন্য সব সংকটই হলো তার অংশবিশেষ। গত ৫০ বছরের তুলনায় গত ১৫ বছরে ভারতে অসাম্য বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর সংকটের মতোই। পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত 'ফোর্বস' ম্যাগাজিন প্রতি বছর বিশ্বের কোটিপতিদের একটি তালিকা প্রকাশ করে, কোন দেশে কত কোটিপতি রয়েছেন। ১৯৯১ সালে যখন 'ফোর্বস' এই তালিকা প্রকাশ করত না, তখন ভারতে ডলারের অঙ্কে কোটিপতি বা ডলার কোটিপতির সংখ্যা ছিল শূন্য। ২০০১-এ 'ফোর্বস' জানায়, ৮ ভারতীয় ডলার কোটিপতিতে পরিণত হয়েছেন। ২০১২-তে যখন ভারতে জনগণনার তথ্য পাওয়া যায়, তখন তা বেড়ে হয়েছে ৫৩। বর্তমান বছরে ভারতে ডলার কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে পৌঁছেছে ১২১-এ। ভারতে গড় মাথাপিছু উৎপাদনের ২২ শতাংশ ভোগ করছেন এই ১২১ জন ব্যক্তি! এঁদের মধ্যে একা একজনই ভোগই করছেন ১০ শতাংশ। তিনি মুকেশ আম্বানি। শুধু গত বছর তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত বছর ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ, মুকেশের আয় প্রতি ঘণ্টায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ভারতে একজন খেতমজুর প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও কি এই আয়ের ধারে কাছে পৌঁছাতে পারবেন, অথবা যে কোনও সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তি? হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে, 'রেগা'র কাজে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিক ৩৬৫ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে শনি, রবি সহ কোনও ছুটির দিন ছাড়াই একটানা কাজ করলে যে সম্মিলিত মজুরি পান, তা-ই মুকেশের বারো মাসের রোজগার। কোথা থেকে এই বিশাল সম্পদ আসছে? আসছে আমাদের নয়া উদারবাদী নীতি থেকে, যা মুকেশকে টেলিকম দুনিয়াতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করছে।

এই প্রথমবার আমরা দেখছি, কোনও বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপনে

দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। মোদী বিজ্ঞাপিত হচ্ছেন 'জিও' ফোনের জন্য। বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে 'জিও'কে, সরকারিভাবেই।,আমরা বলতে পারি, গত বছরে ভারত 'সেল্ফ রিলায়েন্স' অথবা স্বনির্ভরতা ছেড়ে চলে গিয়েছে 'রিলায়েন্স'-এর হাতে। 'ক্রেডিট সুইস'-এর সমীক্ষা দেখিয়ে দিয়েছে, ২০১৬-তে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের ১ শতাংশের হাতে দেশের ৫৮.৪ শতাংশ সম্পদ। আমেরিকায় এই হার হলো ৪২ শতাংশ। একমাত্র রাশিয়া কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু কোটিপতিদের তালিকায় আমরা রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছি। আমরা এখন বিশ্বে চতুর্থ। ডলার কোটিপতির সংখ্যায় চতুর্থ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার উন্নয়ন সূচকে আমরা ১৩১তম স্থানে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আরও শোচনীয় স্থানে আমরা, এখন ১১৯। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অসাম্যের উপাদান বিদ্যমান। বিশেষত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার আগে বি জে পি তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে আগামী পাঁচ বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছিল। একই সঙ্গে তারা ঘোষণা করে, ক্ষমতায় এলে কৃষকদের উৎপাদন খরচের সঙ্গে ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠিত কৃষকদের জাতীয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আরও ৫০ শতাংশ খরচ যুক্ত করা হবে। অথচ ক্ষমতায় এসেই পরের বছর ২০১৫-তে তারা আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে জানায়, এই প্রতিশ্রুতি রাখা সম্ভব নয়। তথ্যের অধিকার আইনে দাখিল করা এক প্রশ্নের জবাবে মোদী সরকারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই পদক্ষেপ নিলে বাজার দরের গুরুতর বিকৃতি ঘটবে। অর্থাৎ এই সরকার বাজারকে গুরুত্ব দেয়, জনসাধারণকে নয়। আবার ২০১৬-তে সরকারের কৃষিমন্ত্রী মন্তব্য করলেন যে, তারা না কি এই প্রতিশ্রুতি দেননি! ২০১৭-তে বি জে পি-কে বলতে শোনা যায় যে, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই কমিশনের চেয়েও আরও অগ্রবর্তী সুপারিশ করেছেন। তাকে 'মধ্য প্রদেশ মডেল' নামে প্রচার করে দুই শিক্ষাবিদ আবার মধ্য প্রদেশ

নিয়ে লেখা এক বইয়ে এই মডেলের প্রচুর প্রশংসাও করেছেন। যেদিন মধ্য প্রদেশের মান্দসৌরে কৃষকরা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান, সেই একই দিনে এই বই প্রকাশ করা হয়। এই বছরের বাজেটের ১৩ ও ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে মোদী সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, তারা না কি প্রতিশ্রুতি পালন করে ইতিমধ্যেই অধিকাংশ শস্যের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে ফেলেছে। সুতরাং কৃষকদের আর আন্দোলন করে কী হবে?

জমির মালিকানা থেকে দৈনন্দিন কৃষিকাজ, সবই এখন কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত। সার থেকে রাসায়নিক সবই তারা সরবরাহ করছে। 'মনস্যান্টো' এখন 'বায়ার' কোম্পানির দখলে। দুই-ই বৃহৎ কর্পোরেট। 'মনস্যান্টো'র দাবি, তাদের এমন এক সামগ্রী আছে, যাতে না কি কোনও রাসায়নিক নেই। 'বায়ার' তাই 'মনস্যান্টো' নিয়ে নিল। এরা বিশ্বের বীজের বাজারের ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও 'ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন-এর খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে যে, পারিবারিক কৃষি থেকে বিশ্বের ৭০ শতাংশ খাদ্য আসে। আমেরিকার অধিকাংশই কর্পোরেট কৃষি, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পপুঁজির মালিকানাধীন কৃষি। এর সঙ্গে রয়েছে আরও কিছু পুঁজিবাদী দেশ। তা সত্ত্বেও এটাই সত্য যে, আজও বিশ্বের ৭০ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ করছে পারিবারিক কৃষি।

কৃষির আরও এক বৃহৎ সমস্যা ঋণ, যা কৃষক ও খেতমজুরদের ক্ষেত্রে ক্রমশ গলার ফাঁস হয়ে চেপে বসছে। শুধু পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেই তিনটি জেলায় ৮৬ শতাংশ কৃষক ও ৮০ শতাংশ কৃষক ঋণভারে জর্জরিত। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত খেতমজুররাই। ঋণ শোধ করার মতো আয় তাঁরা করেন না। পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৯১ থেকে ২০০২-এর মধ্যে আমাদের দেশে কৃষকদের ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এদের সংখ্যা নির্ধারণে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলেও দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যা দৈত্যাকার। পাঞ্জাব দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালে 'অ্যাবোলিশন অব ইনডেটনেস অ্যাক্ট' চালু করে। উদ্দেশ্য, কৃষকদের ঋণজাল থেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয় রাজ্য কেরালা, যারা রাজ্যের পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক প্রভাত

পট্টনায়েকের নেতৃত্বে একই আইন সেখানে চালু করতে সক্ষম হয়। আসলে ব্যাঙ্কগুলিকে ক্রমশ কর্পোরেটমুখী করে তোলা হচ্ছে, এমন কী কৃষিঋণের ক্ষেত্রেও। 'নাবার্ড'-এর দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে কৃষি ঋণের শতকরা ৫৩ ভাগই মুম্বাইয়ের ব্যাঙ্কগুলি থেকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্রামীণ ক্ষেত্রে তা ৩৮ শতাংশ। যেখানে এখনও মহারাষ্ট্রে শতকরা ৫৫ ভাগই গ্রাম, সেখানে গ্রামীণ কৃষিঋণ দেওয়া হলো মাত্র ৩৮ শতাংশ। দেশের রাজ্যে রাজ্যে ঋণ দেওয়ার অনুপাত মহারাষ্ট্রেরই মতো। তার ফলে কৃষকদের জীবনজীবিকা ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। দিল্লির কনট প্লেসে আম্বানি একটি হিমঘর বানিয়েছেন, যাতে ৪ শতাংশ কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ঋণের পার্থক্যকে ক্রমশ কমিয়ে আনা হচ্ছে। কাউকে ঋণ মঞ্জুর করতে হলে হয় তো এবার কৃষিঋণও মঞ্জুর করে দেওয়া হবে, যা বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং কৃষি ও কৃষকের জীবনে ডেকে আনছে ভয়াবহ সংকট।

এই সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যেও নাসিক থেকে মুম্বাই ৪০ হাজার দরিদ্র কৃষকের লঙ মার্চ সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর শুরুতে কোনও সংবাদমাধ্যম তাকে গুরুত্বই দেয়নি। নাসিক থেকে শুরু করার সময়ে বাসস্ট্যান্ড থেকে ২০০-৩০০ কৃষক ছিলেন এই লঙ মার্চের সঙ্গে। তখন শুধু 'পিপলস আর্কাইভ অব রুরাল ইন্ডিয়া' সংক্ষেপে 'পারি' এই খবর শুরু থেকেই দিতে থাকে। কিন্তু দু' দিন যেতে না যেতেই সংবাদমাধ্যমগুলি টের পায়, তারা কী সংবাদ হারাতে বসেছে। নাসিক ছাড়তেই সংখ্যাটা বেড়ে হয় ১২ হাজার। আর মুম্বাই পৌঁছাতেই সেই সংখ্যা ৪০ হাজারও ছাড়িয়ে গেল। সেই লঙ মার্চের দরিদ্র কৃষকরা হেঁটে চলেছেন হাইওয়ে ধরে। তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে ৩৯ ডিগ্রি। পায়ে কোনও জুতো নেই। রাস্তার আগুনে তাপ থেকে বাঁচতে পায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন সেলোটেপ। তাদের পা দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরছে, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই কারো। অদম্য দৃঢ়তায় কৃষকরা এগিয়ে চলেছেন। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে মুম্বাই পৌঁছে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ১২ই মার্চ সেখানে বোর্ডের পরীক্ষা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায়

যাতে অসুবিধা না হয়, রাস্তায় যানবাহন চলাচলে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাই নীরবে রাতটুকু হেঁটে তাঁরা মূল শহরে এসে প্রবেশ করলেন। মুম্বাইয়ের শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবকরা রাতে শান্তিতে ঘুমালেন। এই লঙ মার্চে শুধু মুম্বাইয়ের শ্রমজীবী মানুষ ও মধ্যবিত্ত মানুষই তাঁদের সমর্থন উজাড় করে দিয়েছেন, তা নয়। তাদের সঙ্গে লক্ষণীয়ভাবে শামিল হয়ে দক্ষিণ মুম্বাইয়ের ধনী ব্যক্তিরাও খাবারের প্যাকেট ও পানীয় জল সরবরাহ করেন এই কৃষক লঙ মার্চ-এ।

ভারতের কৃষি সংকট এখন আর কৃষিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই।

এই পরিস্থিতি আজ এক সামাজিক সংকটের চেহারা নিয়েছে। সভ্যতার সংকট বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ, নিজেদের জীবনজীবিকা বাঁচানোর তাগিদে দেশের ক্ষুদ্র কৃষক এবং শ্রমিকদের বৃহত্তম অংশটি নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। কৃষি সংকট বলতে এখন আর মাত্র জমির অধিকার হারানোকেই বোঝায় না, বোঝায় না কেবল জীবন-জীবিকা এবং উৎপাদনশীলতা হারানোকেও। এই সংকট চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, তলানিতে এসে ঠেকা আমাদের মানবিকতা বোধকে, ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা আমাদের মনুষ্যত্বকে। নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত মানুষগুলোর যন্ত্রণা, বিগত কুড়ি বছরে ৩ লক্ষের অধিক মানুষের আত্মহত্যা দেখেও আমরা নীরব দর্শক হয়ে দিব্যি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকছি! কতিপয় 'নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ' আমাদের চারপাশের এই ভয়াবহ যন্ত্রণাকে উপহাস করছেন, এমন কী এই সংকটের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন!

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এন সি আর বি) গত দু' বছর ধরে কৃষকদের আত্মহত্যার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেনি। তার আগের কয়েক বছর ধরেই দেশের বড় বড় রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে অসত্য ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য দেওয়ায় সংস্থাটির আনুমানিক পরিসংখ্যানে বিস্তর ফাঁক থেকে গেছে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও অনেক রাজ্যের কথা, যেগুলি দাবি করেছে, তাদের রাজ্যে একজন কৃষকও আত্মহত্যা করেননি। ২০১৪ সালে ১২টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি করেছে, সেখানে

কৃষকদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা শূন্য। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে এন সি আর বি-র রিপোর্টে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে প্রমাণ করার জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতিতেই এক ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে।

এত প্রয়াস সত্ত্বেও আত্মহত্যার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

এদিকে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। মধ্য প্রদেশে কৃষকদের গুলি চালেয়ে হত্যার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। মহারাষ্ট্রে কৃষকদের সঙ্গে সরকারের চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায় তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। সর্বোপরি দেশের প্রায় সর্বত্র নোট বাতিলের কারণে কৃষিজীবীদের জীবনজীবিকায় বিধ্বংসী প্রভাব পড়েছে। গ্রামীণ মানুষের যন্ত্রণা, ক্ষোভ বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র কৃষকরাই নন। শ্রমিকরাও দেখছেন, কেমন করে সুপরিকল্পিতভাবে রেগা (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন) প্রকল্পের কাঠামোটিকেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত সমস্ত মৎস্যজীবী মানুষ, অরণ্যবাসী সম্প্রদায়, গ্রামীণ কারিগর, শোষিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ক্ষুব্ধ সেইসব মানুষ, যাঁরা ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে পড়তে পাঠিয়ে টের পাচ্ছেন, রাষ্ট্র কীভাবে নিজের স্কুলগুলিকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজের হাতেই হত্যা করছে। এছাড়াও চাকরির অনিশ্চয়তায় অসন্তোষ বেড়ে চলেছে সাধারণ সরকারি কর্মচারী, পরিবহণ কর্মী এবং সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত ছোটখাট চাকরিজীবীদের মধ্যেও।

গ্রামীণ জীবনের এই সংকট এখন আর গ্রামের চৌহদ্দিতেই আটকে নেই। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে দেশে কর্মসংস্থান ব্যাপক মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।

২০১১ সালের জনগণনা সম্ভবত স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে ব্যাপকতম, সংকটজাত অভিবাসনের দিকে ইঙ্গিত করেছে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ তাঁদের জীবন-জীবিকা ঘিরে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার তাগিদে দেশান্তরী হয়ে চলে যাচ্ছেন অন্যান্য গ্রাম, গ্রামীণ জনপদ, মফস্বল শহর, শহুরে বসতি এবং বড় বড় শহরগুলিতে। তাঁরা যাচ্ছেন কাজের খোঁজে, অথচ এইসব জায়গায় তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থাই নেই।

২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ সালের তুলনায় নথিভুক্ত কৃষকের (প্রধান কৃষক) সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি কমে গিয়েছে। একদা গর্বিত বহু খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক বর্তমানে গৃহশ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শহুরে এবং গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণির হাতে এখন এই মানুষরা শোষিত হচ্ছেন।

এইসব নিপীড়িত মানুষের কথায় সরকার বাহাদুর মোটেই কর্ণপাত করে না। সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকাও তথৈবচ।

আর যদি বা সংবাদ মাধ্যম বিষয়গুলির উপর কদাচিৎ দৃষ্টিপাত করে, সেক্ষেত্রেও পুরো সংকটকে শুধু মাত্র 'ঋণ মকুব'-এর দাবিতে পর্যবসিত করা হয়। সাম্প্রতিক কালে সংবাদ মাধ্যম কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এম এস পি) দাবিটিকে অর্থাৎ উৎপাদন খরচ (সি ও পি- ২)-এর সঙ্গে ৫০ শতাংশ যুক্ত করার দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের এই দাবিটিকে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে বলে সরকারের তরফে যে দাবি করা হচ্ছে, সংবাদ মাধ্যম কিন্তু মোটেই তা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করছে না, তার সত্যতা খতিয়ে দেখছে না। জাতীয় কৃষক কমিশন (এন সি এফ, যা স্বামীনাথন কমিশন নামেই পরিচিত) কৃষি এবং কৃষকদের বিষয়ে যে আরও এক গুচ্ছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছিল, সে ব্যাপারেও সংবাদ মাধ্যম মুখে কুলুপ এঁটেছে। এন সি এফ-এর বেশ কয়েকটি রিপোর্ট সংসদে বিগত ১২ বছর ধরে আলোচনা ছাড়াই পড়ে রয়েছে। এছাড়া ঋণ মকুবের আবেদনের সমালোচনা করার সময়ে প্রচার মাধ্যম ভুলেও উল্লেখ করে না যে, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি এবং ব্যবসায়ীরাই ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় দেউলিয়া করে তোলা অলাভজনক সম্পদের অধিকাংশ হাতিয়ে নিয়ে বসে আছে।

অবিলম্বে একটি বৃহৎ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ কর্মসূচীর পাশাপাশি সংসদে এই সংকট এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনব্যাপী একটি বিশেষ অধিবেশনের দাবি তোলা দরকার। সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে এই আলোচনা হওয়া দরকার।

কীসের উপর ভিত্তি করে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে? অবশ্যই

ভারতবর্ষের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে। বিশেষ করে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সংবিধানের নির্দেশিকাগুলির উপর নির্ভর করে। সংবিধানের এই অধ্যায়টি 'আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস' এবং 'সামাজিক অবস্থা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা...'-র বিষয়ে কথা বলে। এই সাংবিধানিক নীতিগুলি এমন "একটি সমাজব্যবস্থার কথা বলে, যেখানে জাতীয় জীবনের সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত হবে ন্যায়।"

এই সংসদীয় আলোচনার আরেকটি ভিত্তি হবে সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা, কাজ, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি। পুষ্টি এবং জনস্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধি করে সুস্বাস্থ্যের অধিকার, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার অধিকার, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সমান কাজে সমান বেতনের অধিকার, মানবিক এবং ন্যায়সংগত কর্মপরিবেশের অধিকার– এইগুলিই হলো সংবিধানের প্রধান প্রধান নীতি। ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার বলেছে, সংবিধানের এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আমাদের মৌলিক অধিকারের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্য কী হবে? এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামতগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সংকটময় পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত মানুষজন অবশ্যই এইগুলিকে সংশোধন এবং এখানে আরও নতুন সংযোজন করতে পারেন:

৩ দিন: স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা– ১২ বছর হলো স্থগিত রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০৪ থেকে অক্টোবর, ২০০৬ সাল– এই মেয়াদকালে স্বামীনাথন কমিশন পাঁচটি রিপোর্ট জমা দেয়, যার উপজীব্য শুধু এম এস পি ছিল না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় এই রিপোর্টে আলোচিত হয়েছিল। রিপোর্টে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় ছিল, জমির উৎপাদনশীলতা, লাভজনক উর্বরতা, স্থায়িত্ব, প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিজনিত সমস্যা, শুষ্কভূমি চাষ, ফসলের মূল্য সংক্রান্ত অভিঘাত এবং স্থিরতা এবং আরও অনেক কিছু। কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বতোভাবে বেসরকারিকরণকে

ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আসন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের মোকাবিলাও করতে হবে।

৩ দিন: জনগণের সাক্ষ্য– এই সংকটের কবলে পড়ে যেসব মানুষ ক্ষতির শিকার হয়েছেন, সংসদের কেন্দ্রীয় হলে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে দেওয়া হোক। তাঁরা কথা বলবেন এবং এই সংকটের স্বরূপ, কেমন করে এই সংকট লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীকে বিপন্ন করেছে ইত্যাদি বিষয়ে দেশের মানুষকে অবহিত করবেন। আর এই সংকট কৃষির পরিসর ছাপিয়ে কেমন করে চারদিকে ব্যাপ্ত হয়েছে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণের ফলে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনতা শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে সব দরিদ্র মানুষের অবস্থাই সঙ্গিন করে তুলেছে, সেসব কথাও বলবেন। সারা দেশে গ্রামীণ পরিবারগুলির ঋণের খাতগুলির মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলা খাতটি হলো স্বাস্থ্য, সম্ভবত দ্রুততম অথবা দ্বিতীয় দ্রুততম খাত।

৩ দিন: ঋণ সংকট– কৃষকদের মধ্যে ঋণের বোঝার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। মৃত কৃষিজীবীরা বাদেও লক্ষ লক্ষ কৃষক ঋণের বোঝায় জর্জরিত। ফলস্বরূপ, তাঁরা নিজেদের চাষের জমি হারাচ্ছেন। অন্যদিকে, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারি নীতিই প্রকৃতপক্ষে গ্রামে গ্রামে মহাজনদের ব্যবসার পথ প্রশস্ত করেছে।

৩ দিন: দেশের ব্যাপক জল সংকট– শুধুমাত্র খরার প্রেক্ষিতে এই সংকটকে ভাবলে চলবে না, এই সংকট খরার তুলনায় অনেক বড়। বর্তমান সরকার 'ন্যায্য' মূল্যের নামে জলের বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা করে চলেছে। একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে পানীয় জলের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই জীবনদায়ী সম্পদের বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে। একমাত্র এইভাবেই এই মহামূল্য সম্পদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং জলে সকলের বিশেষ করে ভূমিহীন মানুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩ দিন: মহিলা কৃষিজীবীদের অধিকার– দেশের মহিলা কৃষিজীবীদের জমির মালিকানা সহ অন্যান্য অধিকারের কথা বাদ দিয়ে কিছুতেই কৃষি

সংকটের সমাধান সম্ভব হবে না। খেতেখামারে সর্বাধিক পরিশ্রম করেন কৃষিজীবী মহিলারাই। অতএব তাঁদের সমস্যার কথা সর্বাগ্রে ভাবতে হবে সংকটের মোকাবিলা করতে হলে। রাজ্যসভায় অধ্যাপক স্বামীনাথন মহিলা কৃষকদের অধিকার সংক্রান্ত বিলটি ২০১১ সালে পেশ করেন (২০১৩ সালে তামাদি হয়ে যায়)। বর্তমানে এই বিলটিই প্রাথমিকভাবে এই বিষয়ে আলাপ, আলোচনা, বিতর্কের জন্য আদর্শ পরিসর হিসাবে কাজ করতে পারে।

৩ দিন: নারী ও পুরুষ উভয়প্রকার ভূমিহীন শ্রমিকদের অধিকার– কৃষি সংকটজনিত দুরবস্থার কারণে গ্রামগুলি থেকে যে বহুমুখী অভিবাসন হয়েছে, তার ফলে এই সংকট এখন আর গ্রামাঞ্চলের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নেই। এই শ্রমিকরা যেখানেই অভিবাসী হয়ে থাকুন না কেন, সেখানকার কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের সময়ে এই ভূমিহীন শ্রমিকদের প্রয়োজন। তাঁদের অধিকার এবং তাঁদের প্রেক্ষাপট যেন অবশ্যই বিবেচিত হয়।

৩ দিন: কৃষি বিষয়ে তর্কবিতর্ক– আগামী ২০ বছরে আমাদের দেশের কৃষির স্বরূপ কী হবে? কর্পোরেট মুনাফা নিয়ন্ত্রিত এক কৃষি ব্যবস্থা? না কি সেই কৃষি ব্যবস্থা, যা গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং পরিবার– যাঁদের অস্তিত্বই কৃষিনির্ভর, তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হবে? এছাড়াও কেরালার কুদুম্বশ্রী আন্দোলনের মতো শক্তিশালী গোষ্ঠীনির্ভর কৃষি (সমষ্টিভিত্তিক চাষ) ব্যবস্থার মতো চাষের ক্ষেত্রে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাগুলির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এগতে হবে। সর্বোপরি আমাদের ভূমি সংস্কারের অসমাপ্ত কর্মসূচিটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। উপরের সব তর্কবিতর্কগুলি তখনই প্রকৃতপক্ষে অর্থপূর্ণ হবে, যখন সেগুলি আদিবাসী ও দলিত কৃষক এবং শ্রমিকদের অধিকারের দিকটিকে মাথায় রাখতে সক্ষম হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

কোনও রাজনৈতিক দলই খোলাখুলিভাবে এই অধিবেশনের বিরোধিতা করবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে এই কর্মসূচী সুনিশ্চিত করবে? দেশের সর্বহারা মানুষ নিজেরাই এই কর্মসূচী পরিচালনা করবেন।

এই বছর মার্চ মাসে নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী লঙ মার্চে

৪০ হাজার কৃষক, শ্রমিক শামিল হয়েছিলেন। উপরোক্ত দাবিদাওয়াগুলির বেশ কয়েকটি তাঁদের লঙ মার্চের দাবির মধ্যে ছিল। মুম্বাইয়ের দাম্ভিক সরকার পদযাত্রায় শামিল হওয়া এই মানুষজনকে 'শহুরে মাওবাদী' বলে দেগে দেয়, তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। কিন্তু রাজ্য বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়ে এই জনসমুদ্র যখন মুম্বাইয়ে আছড়ে পড়ল, তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরকার মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো। এইভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষ সরকারকে শায়েস্তা করেছিলেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ এই প্রতিবাদীরা মুম্বাইয়ে এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল শহরের শ্রমিকশ্রেণি নয়, মধ্যবিত্ত, এমন কী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু মানুষও গভীর সহানুভূতিতে প্রতিবাদী কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থনে চার দেওয়ালের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই কর্মসূচীকে এইবার জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে ২৫ গুণ জোরালো প্রতিবাদ সহ। সহায় সম্বলহীনদের লঙ মার্চ আর শুধু মাত্র কৃষক ও শ্রমিকের লঙ মার্চ নয়, এই সংকটে বিধ্বস্ত সমস্ত মানুষই শামিল হবেন এই লঙ মার্চে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, যাঁরা এই সংকটে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হননি, কিন্তু সহনাগরিকদের দুর্দশায় সমব্যথী হয়েছেন, তাঁরাও শামিল হবেন এই প্রতিবাদে। শামিল হবেন তাঁরা, যাঁরা ন্যায় এবং গণতন্ত্রের পক্ষে। সারা দেশের প্রতিটি অংশ থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়ে দেশের রাজধানীতে এসে মিলিত হবে। আর লালকেল্লার উদ্দেশে যাত্রা নয়, আর যন্তরমন্তরে মৃত কৃষকের খুলি নিয়ে অবস্থান নয়। এই লঙ মার্চে শামিল হওয়া প্রতিবাদী মানুষ সংসদ ভবন ঘেরাও করে তাঁদের কথা শুনতে, বুঝতে এবং সেই মতো কাজ করতে জনপ্রতিনিধিদের বাধ্য করবেন। হ্যাঁ, তাঁরা দিল্লি দখল করবেন।

এই কর্মসূচী সংগঠিত করতে হয় তো অনেক মাস লাগবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা একটি বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রকান্ড চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কৃষিভিত্তিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন এবং আরও অন্যান্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মিলে বৃহত্তম, ব্যাপকতম, অভূতপূর্ব একটি জোট গঠন

করা দরকার। এই জোট শাসকের রোষের শিকার হবে, শাসকের বশংবদ সংবাদ মাধ্যমও তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। প্রতি মুহূর্তেই সংবাদ মাধ্যম এই প্রতিবাদকে তাচ্ছিল্য করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, কোনও কিছুই অসম্ভব নয় এবং সব কিছুই সম্ভব হতে পারে। দরিদ্র জনতার ক্ষমতাকে খাটো করলে খুব বড় ভুল হবে। বড় বড় বুলি আওড়ানো শ্রেণি নয়, বরং এইসব অগুনতি সাধারণ দরিদ্র মানুষের হাতেই আজও গণতন্ত্র বেঁচে আছে।

এই কর্মসূচীটি হবে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের এক চূড়ান্ত, অভূতপূর্ব রূপ। মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে নিজেদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেন, তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রায় দশ লক্ষ বা তারও বেশি মানুষ এই পদযাত্রায় যোগ দেবেন। হয় তো ভগৎ সিং বেঁচে থাকলে বলতেন: বধিরকে শোনানোর, অন্ধকে দেখানোর আর বাক্‌শক্তিহীনের মুখে বুলি ফোটানোর এইটাই একমাত্র পথ।

গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের এটাই হয়ে উঠুক সর্ববৃহৎ কর্মসূচী। আমাদের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে এভাবেই যুক্ত হয়ে যান জনসাধারণ। ভারতের সংবিধানে আমাদের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। সেগুলি হলো– কাজ, খাদ্য, বাসস্থান, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মৌলিক অধিকার। এসবই সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি। এগুলি জনসাধারণের অধিকার, যার জন্য দাবি জানাতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আমরা সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাব কি না! ১৯৪৫ সালের ২৯শে নভেম্বর বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের হাতে সংবিধান তুলে দিয়ে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, রাজনীতিতে গণতন্ত্র আছে। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজে কোনও গণতন্ত্র নেই। অর্থনীতি ও সমাজে গণতন্ত্রের এই অভাব এবং বিপরীত রাজনীতিতে গণতন্ত্রই আমাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের নৈতিকতাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ষাট-সত্তর বছর পরে এটা কতখানি সত্যি? কতটা নৈতিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি? ২০০৪ সাল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থীদের হলফনামা

দিয়ে নিজেদের আয় ও সম্পত্তি ঘোষণা করতে হচ্ছে। ২০০৪ অর্থাৎ প্রথম বছরেই জমা পড়া হলফনামায় দেখা গিয়েছিল, নিজেদের ঘোষণা মতো ৩২ শতাংশ সাংসদই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। ২০০৯ সালে এই হার বেড়ে হয় ৫৩ শতাংশ। আর ২০১৪ সালে সব কিছু ছাপিয়ে দুর্নীতিতে যুক্ত সাংসদদের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮২ শতাংশ। হয় তো আগামী বছর এই হার শতকরা একশো ভাগকেই ছুঁয়ে ফেলবে! আমাদের ভাবতে হবে। পরিবর্তন আমাদের সামনেই রয়েছে। শুধু প্রশ্ন, আমরা তার পক্ষে সম্মতি দেব কি না।

সাংবাদিক পি সাইনাথ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বহু সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি দ্য হিন্দু পত্রিকার রুরাল অ্যাফেয়ার্স এডিটর ছিলেন। গ্রামীন সাংবাদিকতায় তাঁর কাজ নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করেছে। তাঁর লেখা বই 'Everybody Loves a Good Drought' তারই অন্যতম নিদর্শন। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনের শৈল্পিক দক্ষতার জন্য তিনি রমন ম্যাগসেসাই পুরস্কার পেয়েছেন, কানাডার অ্যালব্যার্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট পেয়েছেন। ভারতের এবং বিদেশের বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতায় শিক্ষাদানের কাজও করেছেন। কোনো কর্পোরেট সাহায্য ছাড়াই সাইনাথ ডিজিটাল মাধ্যমে পিপলস্ আর্কাইভ অব রুরাল ইন্ডিয়া (পারি) প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরনের উদ্যোগ। রাজনৈতিক শাসক, কর্পোরেট পুঁজি এবং কর্পোরেট মিডিয়া যখন মিলিতভাবে গ্রামভারতকে দৃশ্যের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করছে, সাইনাথ তখন লড়াই করছেন গ্রামভারতকে আরও বেশি করে দৃশ্যগোচরে আনতে।